উন্নয়নের ব্র্যান্ডিং এবং দেশের আসল অবস্থা

মাহা মির্জা

বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারা নিয়ে সরকার, মিডিয়া এবং অর্থনীতিবিদদের উচ্ছ্বাস চলছে বেশ কিছুদিন। কিন্তু সেই উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়, তার স্বরূপ ও দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কী, কার বিনিময়ে চাকচিক্য বাড়ছে সেসব প্রশ্ন ব্যয়বহুল প্রচারণার ঢাকঢোলের নীচে চাপা পড়ে যায়। বর্তমান লেখায় দেশ ও মানুষের প্রকৃত অবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরে উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচলিত বদ্ধবিশ্বাস ও প্রচারণা নিয়ে মোহমুক্ত পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'ভারত বনাম বাংলাদেশ' তুলনাটি ক্ষতিকর

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন, দেখিয়েছেন মানবসম্পদের প্রায় সবকটি সূচকেই ভারত ও পাকিস্তান থেকে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। আপাতদৃষ্টিতে এটি ভাল সংবাদ। কিন্তু আমাদের ভারত-বিদ্বেষী মনস্তত্ত্বে এই 'ভারত বনাম বাংলাদেশ' তুলনাটি আদতে ক্ষতিকর। কারণ উন্নয়নের চূড়ান্ত 'স্ট্যান্ডার্ড' হিসাবে আমরা ধরেই নিয়েছি ভারতকে। অর্থাৎ ভারত থেকে সবগুলো সূচকে এগিয়ে থাকলেই বাংলাদেশ খুব ভাল করছে। কিন্তু সত্য এটাই যে ভয়াবহ দারিদ্র্যের দেশ ভারত কিংবা মৌলবাদ ও ফৌজিতন্ত্রের খপ্পরে পড়া পাকিস্তানকে মানদণ্ড ধরলে আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক মনে হলেও বাংলাদেশের প্রকৃত ভগ্ন ও নগ্ন দশাটি আড়ালেই থেকে যায়। আবার অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা মানবসম্পদের প্রায় প্রতিটি সূচকেই বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে থাকলেও শ্রীলঙ্কা নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। মহা গরিবির দেশ ভারত ও পাকিস্তানকেই একমাত্র মানদণ্ড ধরায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পুষ্টিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুগুণ এগিয়ে থাকা শ্রীলঙ্কার সূচকগুলো আমাদের মধ্যে কোন আগ্রহেরও সৃষ্টি করে না।

এ বছর বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তান আর মিয়ানমারও 'উন্নয়নশীল' দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। যদিও ২০২১ সালের মধ্যে সবগুলো পরীক্ষায় পাস এবং তা টিকিয়ে রাখতে পারলেই কেবল ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়া সম্ভব। দুঃখজনক এই যে ভয়াবহ দুর্নীতি, দারিদ্র্য আর ভেঙে পড়া আইনের শাসনের এইসব দেশের সঙ্গেই আজকাল আমাদের একচেটিয়া প্রতিযোগিতা। আরেকটু ওপরের দিকে তাকানোর মত মনোবলও আমাদের আর অবশিষ্ট নেই।

উন্নয়নের সূচকগুলো কি সমালোচনার ঊর্ধ্বে?

'উন্নয়নশীল' হতে হলে যোগ্যতার মাপকাঠি তিনটি–মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস। অথচ এই সূচকগুলো সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিশেষত মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা বরাবরই লেজে-গোবরে। এই হিসাবে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, ফার্মার্স ব্যাংক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ বা হলমার্ক, এমনকি শেয়ারবাজার লুটেরাদের কুক্ষিগত সম্পদকেও সমাজের দশজনের গড় সম্পদ বলে চালিয়ে দেয়া হয়। হকার, রিকশাচালক, গার্মেন্টস মালিক–সবাইকে মধ্যবিত্ত দেখায়, আর মাঝখান থেকে লুটেরাদের ফুলে ফেঁপে ওঠার দৃশ্যটা ঢাকা পড়ে যায়।

ভারতের জিডিপি যখন ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে, তখনও বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের তালিকায় ভারত ছিল শীর্ষে–প্রায় ৮০ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেছে, ১৯ কোটি ভারতীয় অপুষ্টিতে ভুগেছে, আর প্রতি ৩২ মিনিটে আত্মহত্যা করেছে একজন করে ভারতীয় কৃষক। সিপিডির এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে গত ছয় বছরে জিডিপি বাড়ার দিনগুলোতে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে ৩২ হাজার টাকা, আর সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে ১০৫৮ টাকা[১]। অর্থাৎ মাথাপিছু আয়ের এই সূচকটি আসলে উন্নয়ন, আইনের শাসন, মানুষের ভাল থাকা, খারাপ থাকা– এসবের কিছুই বোঝায় না।

অন্য সূচকগুলোও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। যেমন–সূচক বলছে, মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৭ বলছে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ৪১ শতাংশ মেয়েই দশম শ্রেণির আগেই ঝরে পড়ছে। আবার জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার কমলেও বাংলাদেশে বাড়ছে (অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ)[২]!

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। কিন্তু পাশাপাশি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে খর্বকায় ও অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা। দেশের ৩৬ শতাংশ শিশু খর্বকায়। ৫১ শতাংশ শিশু অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। মারাত্মক অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর তালিকায়ও বাংলাদেশ অন্যতম[৩]। অর্থাৎ যে শিশুগুলোকে বাঁচানো যাচ্ছে, তারা ন্যূনতম পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে না। বেঁচে থাকা শিশু বড় হচ্ছে ক্ষুধায়, কম খেয়ে, অপুষ্টিতে, খাটো গড়নের হয়ে। তাহলে শিশুদের এমন অমানবিক বেঁচে থাকায় কার উন্নয়ন হল? অর্থাৎ সূচক খণ্ডিত বা আংশিক চিত্র দিচ্ছে মাত্র।

মহা গরিবির দেশ ভারত ও পাকিস্তানকেই একমাত্র মানদণ্ড ধরায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পুষ্টিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুগুণ এগিয়ে থাকা শ্রীলঙ্কার সূচকগুলো আমাদের মধ্যে কোন আগ্রহেরও সৃষ্টি করে না।

উন্নয়নের দিনে আইনের শাসন, যৌন সহিংসতা ও জীবনের নিরাপত্তা

'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারে' বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে[৪]! সামগ্রিকভাবে 'আইনের শাসনে' ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২। খেলাপি ঋণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ 'নাম্বার ওয়ান'[৫]! ক্ষমতাবানদের যোগসাজশে দেদার অর্থ আত্মসাৎ চলছেই। নয় বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে তিন গুণ! আর বিচার? উন্নয়নের দেশে বিচারের কী হাল, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রতিদিনের দুঃসংবাদগুলো।

এবার দেখা যাক কেমন আছে উন্নয়নের দেশের মেয়েরা। গত চার বছরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৭ হাজার নারী ও শিশু[৬]। আন্তর্জাতিক জরিপে ঢাকা পৃথিবীর সপ্তম বিপজ্জনক শহর। যৌন সহিংসতায়

ঢাকার অবস্থান চতুর্থ[৭]। ২০০২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যাসংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর ৯৭ শতাংশেরই কোন সাজা হয়নি[৮]। 'ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রোজেক্ট' দেখাচ্ছে, 'সুষ্ঠু তদন্ত', 'দ্রুত তদন্ত', 'সুষ্ঠু আইনি প্রক্রিয়া' ইত্যাদি প্রায় সব কটি সূচকেই বাংলাদেশের স্কোর লজ্জাজনক।

'নাগরিক নিরাপত্তা'র বেলায়ও বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩টি দেশের মধ্যে ১০২। প্রতিবছর রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনায় মুড়িমুড়কির মত মরছে গড়ে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। পোশাকশিল্প, নির্মাণশিল্প, পাহাড়কাটা আর জাহাজভাঙা খাতে স্রেফ অবহেলাজনিত দুর্ঘটনায় বেঘোরে প্রাণ দেয় শত শত শ্রমিক[৯]। বৈদ্যুতিক শকে, বিষাক্ত গ্যাসে, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে 'ফায়ার এক্সিটে'র অভাবে, পুরনো বয়লার ফেটে, উঁচু থেকে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে শ্রমিক মরছে তো মরছেই। বছরে গড়ে ৭০০ শ্রমিক নিহত হচ্ছে। আহত ১৩০০[১০]। কারও কোন মাথাব্যথা আছে কি?

উন্নয়নের দিনে পরিবেশ ও নদী ধ্বংস

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে পরিবেশ ধ্বংসের গল্পটি নেই। কৃষকের 'লাইফলাইন' বাংলাদেশের নদীগুলোর একের পর এক শুকিয়ে যাওয়ার গল্পটি নেই। তবে আলাদা করে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সমীক্ষা হয়েছে। সেখানেও বাংলাদেশের অবস্থান শোচনীয়। পরিবেশ সুরক্ষায় ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯[১১]! পানি, বাতাস, পয়োনিষ্কাশন বা জনস্বাস্থ্য–সব কটি সূচকেই ঢাকার অবস্থান তলানির দিক থেকে শীর্ষে। ভয়াবহ ক্ষতিকর সালফার ডাই-অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইড নির্গমনেও ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষে[১২]। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম আর সিসার দূষণ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে[১৩]। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা বলছে, ঢাকায় সীসা দূষণের শিকার ছয় লাখ মানুষ (বেশির ভাগই শিশু)[১৪] এবং দেশের ১ কোটি ২৭ লাখ মানুষের দেহে অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি ঘটছে[১৫]। এ ছাড়া পর পর কয়েক বছর ধরেই ঢাকা পৃথিবীর সবচেয়ে বসবাস অনুপযোগী শহরগুলোর মধ্যেও শীর্ষে[১৬]। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়ছে সবকিছু। তবু রাস্তা আটকে চলছে উন্নয়নের আনন্দ র‍্যালি! সত্যিই সেলুকাস, এ এক অদ্ভুত উন্নয়নের দেশ!

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে পরিবেশ ধ্বংসের গল্পটি নেই। কৃষকের 'লাইফলাইন' বাংলাদেশের নদীগুলোর একের পর এক শুকিয়ে যাওয়ার গল্পটি নেই। তবে আলাদা করে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সমীক্ষা হয়েছে। সেখানেও বাংলাদেশের অবস্থান শোচনীয়।

'উন্নয়ন', দুর্নীতি ও জিডিপি : একসঙ্গে বাড়ার রহস্য কী?

অনেকেই প্রশ্ন করে, এতই যদি দুর্নীতি, তাহলে জিডিপি বাড়ে কেন? অথচ এমন নয় যে দুর্নীতি হলে জিডিপি বাড়ার সুযোগ নেই! অর্থনীতিতে উৎপাদন বা লেনদেন বাড়লেই জিডিপি বাড়ে। সেই অর্থে রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ বা ফ্লাইওভার নির্মাণে যতই লুটপাট হোক; এমপি, নেতা, ঠিকাদার মিলে যতই ভাগ-বাটোয়ারা করুক, যতই লাফিয়ে লাফিয়ে প্রকল্প ব্যয় বাড়ুক–টাকার লেনদেন তো বাড়ছে, তাই জিডিপিও বাড়বে। যেমন–এক রাস্তা অনর্থক দশবার কাটাকাটি, ভাঙাভাঙি করলেও জিডিপি বাড়ে; দেশের অর্ধেক মানুষ পানিদূষণ, বায়ুদূষণ বা সিসাদূষণে আক্রান্ত হয়ে ওষুধ কেনা বাড়িয়ে দিলে জিডিপি বাড়ে; ঢাকার 'লাইফলাইন' খাল ও নালাগুলো দখল করে প্রভাবশালীদের বহুতল মার্কেট তৈরি হলেও জিডিপি বাড়ে, বাচ্চাদের সবুজ খেলার মাঠগুলো দখল করে বিল্ডিং উঠলেও জিডিপি বাড়ে।

অর্থনীতির পাঠ্যবইগুলোতে এবং দাভোসের মত উঁচু মাপের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনগুলোতেও তাই পরিবর্তন আসছে। পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য বা আইনের শাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে শুধু জিডিপি বা মাথাপিছু আয়ের হিসাব দিয়ে যে উন্নয়ন হয় না, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। যেমন–গ্লোবাল কম্পিটিটিভ ইনডেক্স ২০১৮ বলছে, এশিয়ার মধ্যে নেপালের পরই সবচেয়ে খারাপ রাস্তা বাংলাদেশে[১৭]। অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্বিগুণ-তিনগুণ অর্থ ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ হলেও কয়েক বছরের মাথায় ভয়াবহ দুর্গতি হচ্ছে রাস্তাগুলোর। দ্রুত পুনর্নির্মাণ করার প্রয়োজন পড়ছে। অর্থাৎ আবারও নতুন বাজেট, নতুন লেনদেন, নতুন ভাগ-বাটোয়ারা, নতুন চুরি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রকল্প ব্যয় বা চুরির পরিমাণ বাড়লে জিডিপি বাড়াই স্বাভাবিক। কারণ জিডিপি কেবল 'ফাইনাল প্রোডাক্টে'র মূল্যমান বোঝে। কে পেল টাকার ভাগ–নেতা, জনগণ, না কন্ট্রাক্টর, সেই হিসাবের দায় জিডিপির নেই।

দুর্নীতির টাকা যতক্ষণ দেশে আছে এবং দেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে, ততক্ষণ দুর্নীতি বা লুটপাটের সঙ্গে জিডিপির কোন বিরোধ নেই। যেমন–জেনারেল সুহার্তোর সময়ে ইন্দোনেশিয়া ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ দেশ। আবার একই শাসনামলে ইন্দোনেশিয়ার জিডিপি এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে। অর্থাৎ দুর্নীতির অর্থ দেশের ভেতরে ছিল এবং তা উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছিল। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্রটি এত সরল নয়। এখানে মহামারির মত দুর্নীতি হচ্ছে, ক্ষমতাবানদের যোগসাজশে জামানত ছাড়াই অবাধে ঋণ 'বিতরণ' হচ্ছে, সরকারের কাছের লোকজন বিপুল অর্থসম্পদের মালিক হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লুটের টাকা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। আমরা জানি, শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা খুইয়েছিলেন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা[১৮], যার একটা বড় অংশই বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। 'গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র রিপোর্ট বলছে, ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকা[১৯]! অর্থাৎ আমাদের জাতীয় বাজেটেরও দ্বিগুণ!

এখানে দুটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংক থেকে লুট হয়ে গেলেও সামগ্রিক অর্থনীতিতে তার সরাসরি প্রভাব কতটা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, লুটপাট ও দুর্নীতির টাকার একটা বড় অংশ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, তার পরও জাতীয় মাথাপিছু আয়ে তার প্রভাব পড়ছে না কেন? প্রথমত, আন্তর্জাতিক ঝুঁকি যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে আছে[২০] (এর পরেও একের পর এক নতুন ব্যাংকের অনুমোদন পাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা!)। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রই বলছে, ব্যাংকিং খাতের 'অব্যবস্থাপনা' (পড়ুন লুটপাট) কাটিয়ে উঠতে গত ৯ বছরে তাদের প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দেয়া হয়েছে[২১]। সবচেয়ে খারাপ সংবাদটি হচ্ছে, সরকারি ব্যাংকের হেফাজতে থাকা জনগণের রক্ত পানি করা আমানতের ৫০ শতাংশই এখন বেসরকারি ব্যাংকগুলোর তহবিলে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে! আর এ বছরের শুরুতেই লুটপাট সামলাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আরও ২০ হাজার কোটি টাকা চেয়েছে ৬ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক[২২]। এই বিপুল পরিমাণ

ভর্তুকির টাকা আসবে কোত্থেকে? জনগণের ঘাড়ে পাড়া দিয়ে বাড়তি ট্যাক্স-ভ্যাট আদায় করা ছাড়া আর উপায় কী?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, এতসব দুর্নীতির পরও মাথাপিছু আয় বাড়ছে কেমন করে? উত্তরটি করুণ ও বুকভাঙা। একদিকে প্রতিবছরই গড়ে ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে[২৩], আরেক দিকে খেয়ে না খেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বছরে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে প্রবাসী শ্রমিকরা[২৪]। টাকা পাচার, ব্যাংক লুট, হরিলুট–এতসব কিছুর পরও তাই কাগজে-কলমে গড় মাথাপিছু আয় বাড়ছেই। খেয়াল করুন, শ্রমে-ঘামে বিবর্ণ আধপেটা প্রবাসী শ্রমিকের দিনের পর দিন 'কম খাওয়া' মেন্যুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের প্রাণভোমরা। রক্ত পানি করা এই বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্সের দাপটেই আজ কেউ কেউ বলতে পারেন, 'চার হাজার কোটি টাকা কিচ্ছু না'! রিজার্ভের ৮০০ কোটি টাকা 'কে' বা 'কারা' স্রেফ লুটেপুটে নিয়ে গেলেও আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক।

তাহলে উন্নয়নের দেশে কেমন আছে অর্থনীতির চাকা ঘোরানো সেই মানুষগুলো? সত্য এটাই যে তারা ভাল নেই। উন্নয়নের দেশে কৃষক বছরের পর বছর ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। উন্নয়নের দেশে এশিয়ার সবচেয়ে কম মজুরিতে[২৫] এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে[২৬] কাজ করে গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকরা। উন্নয়নের দেশে টিকতে না পেরে বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে গিয়ে ১৩ বছরে লাশ হয়ে ফেরে ৩৩ হাজার শ্রমিক[২৭]। জনগণের নিরাপত্তা, পরিবেশ, অর্থনীতি বা আইনের শাসন–এই সবগুলো ক্ষেত্রেই প্রতিটি দেশি-বিদেশি জরিপ দেখাচ্ছে সবকিছু ভেঙে পড়ার এক করুণ চিত্র।

নাওমি ক্লেইন তাঁর 'নো লোগো' বইতে দেখিয়েছিলেন পণ্যের ব্র্যান্ডিং আর বিজ্ঞাপনের পেছনে বিরামহীন অর্থ ব্যয় করে কোম্পানিগুলো, পাশাপাশি ভয়াবহ কাটছাঁট চলে শ্রমিকের মজুরিতে। বাংলাদেশের উন্নয়নটা ঠিক এমনই। অভাব, অন্যায় আর ভয়াবহ বিচারহীনতার দেশে বিপুল টাকা-পয়সা খরচ করে উন্নয়ন নামক পণ্যের ঢাকঢোল পেটানোটাই এখন সরকারের একমাত্র 'এস্কেপ রুট'। জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাখার একমাত্র পন্থা। কিন্তু ক্রমাগত ঘা খাওয়া, লাথি খাওয়া মানুষ জানে, এই চোখধাঁধানো উন্নয়নের ব্র্যান্ডিং আসলে কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর 'উন্নয়ন'কে আপামর মানুষের উন্নয়ন বলে চালিয়ে দেয়ার একটি 'গোয়েবলসীয়' ধারার প্রচারণা। যে উন্নয়নে মানুষ ভাল থাকে না, সেই 'উন্নয়ন'কে ক্রমাগত প্রশ্নবিদ্ধ রাখা তাই জরুরি।

মাহা মির্জা: গবেষক ও অ্যাক্টিভিস্ট।
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৭-২০১৮, প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা, সিপিডি
২. প্রথম আলো, 'বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেড়েছে', ৭ মার্চ, ২০১৮
৩. ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০১৬
৪. ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট ২০১৭
৫. বণিক বার্তা, খেলাপি ঋণের হার : উন্নয়নশীল দেশে শীর্ষে বাংলাদেশ, ১৯ মার্চ, ২০১৮
৬. চার বছরে ১৭ হাজার ধর্ষণ মামলা, প্রথম আলো, ২০১৮
৭. থম্পসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন, দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস মেগাসিটিজ ফর উইমেন, ২০১৭
৮. প্রথম আলো, নারী ও শিশুরা বিচার পায় না, ৮ মার্চ, ২০১৮
৯. বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন, ২০১৮
১০. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) সমীক্ষা ২০১৬
১১. এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স ২০১৮
১২. ইউএস এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স, ২৩ মার্চ, ২০১৮
১৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ, ২০১৮
১৪. বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা ২০১৭, বিশ্বব্যাংক
১৫. ক্যান্সার কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ, জাপানিজ জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি (জেজেসিও), ২০১৫
১৬. গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স২০১৭
১৭. গ্লোবাল কম্পিটিটিভ ইনডেক্স ২০১৭-১০১৮
১৮. প্রথম আলো, সাত বছরে আত্মসাৎ ৩০ হাজার কোটি টাকা, ২৮ মার্চ ২০১৬
১৯. গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি ২০১৭, ইলিসিট ফিনান্সিয়াল ফ্লোজ টু এন্ড ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ : ২০০৫-২০১৪
২০. দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
২১. বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৭-২০১৮, প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা, সিপিডি
২২. দৈনিক ইত্তেফাক, মূলধন ঘাটতি পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো চেয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
২৩. প্রথম আলো, এক বছরে ৭৩ হাজার কোটি টাকা পাচার, ৩ মে, ২০১৭
২৪. বাংলাদেশ ব্যাংক, মান্থলি ডাটা অব রেমিট্যান্স ২০১৬-২০১৭
২৫. বণিক বার্তা, এশিয়ার সর্বনিম্ন মজুরি বাংলাদেশ, ১৫ জুলাই, ২০১৭
২৬. ২০১৭ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্ক স্টাডি, ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন
২৭. বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন, ২০১৭

সূত্র: নিউ এইজ, ২৩ মার্চ, ২০১৮